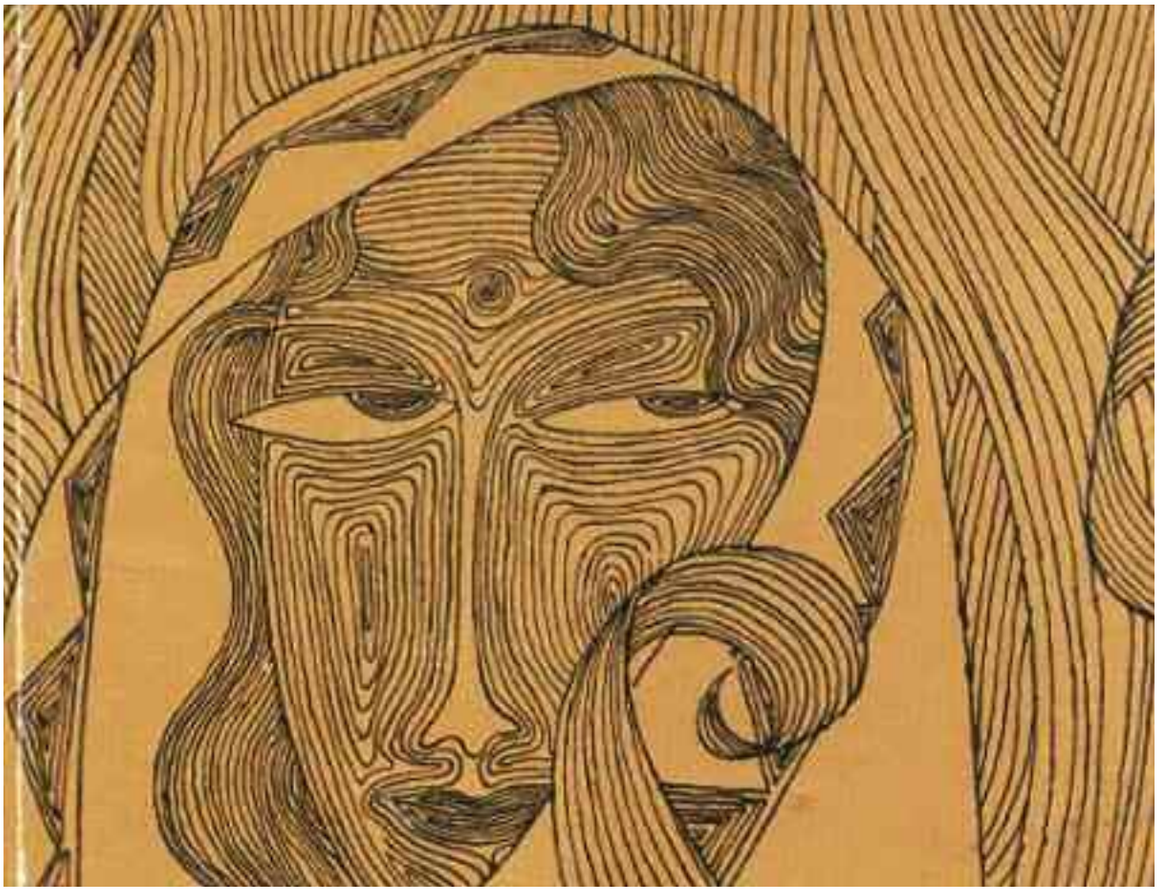

আমীন আল রশীদ

বনলতা সেনের পরিচয় সন্ধান

জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' নামটি আলোচিত হয় ১৯৩৫ সালে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশের পর থেকেই।[১] যদিও 'বনলতা' নামটি আছে ১৯৩৩ সালে রচিত তাঁর 'কারুবাসনা' উপন্যাসে। সেখানে গল্পের নায়ক (বস্তুত জীবনানন্দের সব গল্প-উপন্যাসের নায়ক তিনি নিজেই) বলছেন, কিশোরবেলায় তিনি যে কালো মেয়েটিকে ভালোবাসতেন, বহুদিন আগে তাকে হারিয়েছেন। সেই মেয়ের বর্ণনাও 'বনলতা সেন' কবিতায় বর্ণিত নারীর মতোই—'নক্ষত্রমাখা রাত্রির কালো দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মতো রূপ তার; মিষ্টি ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিরাবরণ দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট।'[২]

প্রবন্ধ

জীবনানন্দ জানাচ্ছেন, তাদের পাশের বাড়িতে থাকতো সেই মেয়ে। কবিতার বনলতা সেনের গায়ের রঙ তিনি উল্লেখ করেননি। কিন্তু উপন্যাসের বনলতার গায়ের রঙ তিনি বলছেন কালো। কবিতার বনলতার চুলকে বলছেন 'বিদিশার নিশার মতো অন্ধকার'; মুখকে বলেছেন 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। আবার কবিতার বনলতার সাথে তার দেখা অন্ধকারে। ফলে তার গায়ের রঙ সেখানে মুখ্য নয়। কিন্তু উপন্যাসের বনলতা যেহেতু পাশের বাড়ির মেয়ে এবং ধরে নেয়া যায় তার সাথে তার নিয়মিত দেখা হতো, ফলে এখানে মেয়েটির গায়ের রঙ প্রাসঙ্গিক। বলছেন, সেই মেয়েকে তিনি ভালোবাসতেন কৈশোরে। আবার পরক্ষণেই বলছেন, তাকে তিনি হারিয়েছেন বহু আগে। অর্থাৎ 'কারুবাসনা' তিনি লিখেছেন ১৯৩৩ সালে, মানে ৩৪ বছর বয়সে। আর বনলতাকে যদি ভালোবেসে থাকেন ১৭-১৮ বছর বয়সে (কারণ এরপরে পড়াশোনার জন্য কলকাতায় চলে যান) এবং হয়তো এরপরে তার সাথে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন। একসময় হয়তো মেয়েটি মারাও যায়। বহু বছর পরে সেই মেয়েটিই হয়তো অন্য কোনো জায়গায় বনলতা সেন নামে এসেছেন। হয়তো এসেছেন দিল্লির পতিতাপল্লীতে বারবণিতার রূপে।

'কারুবাসনা' লেখার দুই বছর পরে ১৯৩৫ সালে বনলতা সেন কবিতাটি প্রকাশিত হয় 'কবিতা' পত্রিকায়; কাকতালীয়/রহস্যজনকভাবে ওই বছরই মারা যান জীবনানন্দের বাল্যবন্ধু সুধীর কুমার—যাকে নিয়ে তিনি লিখেছিলেন—'মুখে তার পাখির নীড়ের মতো আশ্বাস ও আশ্রয়ের হাসি'।[৩]

ঝড়ে বিপদাপন্ন পাখি যেমন নীড়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় পায়—সেরকম প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা তিনি পেয়েছিলেন সুধীর কুমারের কাছে। বনলতা সেনের চোখকেও তিনি বলেছিলেন 'পাখির নীড়' (পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন)। ফলে 'বনলতা সেন' নিয়ে কথার প্রসঙ্গ এলে এই সুধীরকুমারের নামটি মনে রাখা জরুরি। সেই সাথে শান্তি ব্যানার্জি, সুচরিতা দাশ, অশোকানন্দ দাশ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ভূমেন্দ্র গুহ, শামসুদ্দিন আবুল কালাম, অরবিন্দ গুহ প্রমুখ—যারা জীবনানন্দের বন্ধু-পরিজন-সুহৃদ তাদের কথাও মনে রাখতে হবে।

'বরিশালের বনলতা সেন'

বনলতা সেনের সাকিন তিনি লিখেছেন নাটোর। বাংলাদেশের উত্তরের একটি মফস্বল শহর। এটি খুলনাও হতে পারতো। বরিশাল তো বটেই। 'আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল বরিশালের বনলতা সেন' অথবা 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে খুলনার বনলতা সেন'—তাতে ছন্দ ও বিষয়ের ইতরবিশেষ হত না। কিন্তু তিনি লিখেছেন নাটোর; জীবনানন্দের পারিবারিক বন্ধনের সাথে যে শহরটি কোনোভাবেই সম্পর্কিত নয়। তার নিজের জন্ম বরিশালে, বেড়ে উঠেছেন এই শহরেই। এরপর কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন এলাকায়। তাঁর দাদাঠাকুর সর্বানন্দ দাশ মুন্সীগঞ্জের বিক্রমপুর থেকে বরিশালে এসে বসতি গড়েন। ঢাকার সাথেও তাদের সামান্য যোগাযোগ ছিল বৈকি। ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরেই জীবনানন্দ ও লাবণ্যর বিয়ে হয় ১৯৩০ সালের ৯ মে। আর বরিশাল থেকে জীবনানন্দ মূলত স্টিমারে খুলনা হয়ে কলকাতায় যেতেন। তার মায়ের বাড়িও বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা গ্রামে। ফলে কোনো সমীকরণেই তার নাটোরে যাওয়া বা অবস্থানের প্রমাণ মেলে না। কিন্তু তারপরও এই শব্দটির একটা আলাদা তাৎপর্য নিশ্চয়ই রয়েছে।

জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের অনেক চরিত্র, যেমন 'মাল্যবান' নামটি পুরান থেকে নেয়া। বাঙালি পরিবারে এই নামের প্রচলন কম। পুরানে চরিত্রটি প্রান্তিকবর্গের। মাল্যবান হলেন রাক্ষসরাজ সুকেশের তিন সন্তানের মধ্যে প্রথম। তার জন্ম গন্ধর্বকন্যা দেহবতীর গর্ভে। মাল্যবানের স্ত্রী অতিব সুন্দরী। অনলা নামে তার একটি মেয়ে। মাল্যবান স্বর্গের দেবতাদের আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু হেরে গিয়ে পাতালে আশ্রয় নেন। ফলে বনলতা সেন নামে সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে জীবনানন্দের মনের ভেতরে আসলেই কে ছিলেন, তার সুরাহা করা কঠিন। তবে সেই বিতর্কে না গিয়ে আমরা বরং আলোচনাটিকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চাই। ক্লিন্টন বি সিলি মনে করেন, 'নামটির অর্থ বনের লতা, যা রূপসী বাংলার নৈসর্গিক পরিবেশের প্রতি জীবনানন্দের প্রবণতার কারণে তাঁকে প্রলুব্ধ করতেও পারে।'[৪]

থাকে শুধু অন্ধকার

বনলতা সেন বাংলা ভাষার একমাত্র কবিতা, যাকে নিয়ে দশকের পর দশক ধরে আলোচনা ও বিশ্লেষণ অব্যাহত আছে। কবিতা ভালোবাসেন কিন্তু বনলতা সেন পড়েননি বা এই কবিতার প্রেমে পড়েননি, এমন লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমরা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ উত্তর শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, আবুল হাসান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, নির্মলেন্দু গুণ কিংবা আরও পরে হেলাল হাফিজেরও এমন কোনো কবিতার কথা উল্লেখ করতে পারব না, যা নিয়ে এত উন্মাদনা। তাদের অনেক কবিতাই হয়তো শত সহস্রবার পঠিত হয়েছে; কিন্তু বনলতা সেনের মতো এত আলোচনা-তর্ক-বিতর্ক হয়নি। কিন্তু কেন? এর কারণ সম্ভবত একটি লাইন : 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। এই 'অন্ধকার' এবং 'মুখোমুখি' শব্দ দুটির ভেতরেই সমস্ত রহস্য। অন্ধকারে কে কার মুখোমুখি বসে থাকে? এখানে কবির সাথে মুখোমুখি বসে থাকা মানুষটি কে? যে ব্যাকুল প্রতিক্ষার কথা আমরা এই কবিতায় পড়ি, যেভাবে সিংহল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির কাছে কবির ফিরে আসা এবং যাকে দেখে বনলতা সেন বলছেন— 'এতদিন কোথায় ছিলেন' অর্থাৎ বনলতা সেন নিজেও যার জন্য ব্যাকুল, তিনি কে? জীবনানন্দের কবিতার অন্য নারীরা যেমন, সুচেতনা বা সুরঞ্জনার সঙ্গে বনলতার একটা বড় পার্থক্য হলো—এখানে বনলতাকে তিনি আরও বেশি সুনির্দিষ্ট করার জন্য 'সেন' পদবি যুক্ত করেছেন। অর্থাৎ এখানে শুধু বনলতা থাকলে যতটা না, 'সেন' যুক্ত হবার ফলে সেটি অধিকতর রক্তমাংসের মানুষে পরিণত হয়েছে। এরকম আরও কিছু পদবিযুক্ত নাম আমরা তার কবিতায় পাই যেমন— মৃণালিনী ঘোষাল, অরুনিমা স্যানাল, অমিতা সেন, শেফালিকা বোস, অলকা বসু, বিভারানী বোস, নিহারীকা মজুমদার। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। তা হলো জীবনানন্দকে দেখে বনলতা সেন বিস্ময়ে, আনন্দে এবং সম্ভবত শিহরণে জিজ্ঞেস করছেন : 'এতদিন কোথায় ছিলেন'—অর্থাৎ আপনি বলে সম্বোধন করছেন; যার জন্য এত প্রতিক্ষা, তাকে কেন তুমি বলে সম্বোধন নয়? এটি কি কেবলই পরের লাইনের সাথে অন্তমিল রাখার জন্যই?

'বলেছে সে, এতদিন কোথায় ছিলেন?
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।'

যদিও জীবনানন্দ তাকে 'সে' বলেই সম্বোধন করছেন। এখানে জীবনানন্দের সাথে বনলতার সম্পর্ক আসলে কী? ড. আকবর আলি খানের ভাষায় বনলতা কি আসলেই একজন বারবণিতা?

নাটোরের বনলতা সেন

বনলতা সেনের সঙ্গে নাটোরের সম্পর্ক খোঁজা অন্যায্য কিছু নয়। নাটোরবাসী এ ভেবে পুলকিত হতেই পারেন যে, বাংলা ভাষার সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় কবিদের একজন এবং ময়ল রায়চৌধুরী যাকে বলেছেন 'পোস্টমডার্ন প্রফেট', সেই জীবনানন্দ দাশ তাঁদের শহরের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতায়। অথবা এই কবিতাটির কারণেই নাটোর বিখ্যাত হয়েছে। জীবনানন্দ এবং বনলতা সেনের প্রতি এই শহরের মানুষের যে কী আবেগ তার প্রকাশ ঘটে এখানে বনলতা বালিকা বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

ইতিহাস বলছে, এই স্কুলের নামকরণ নিয়ে বিদ্যালয় স্থাপন কমিটির সদস্যদের মধ্যে একসময় বিতর্ক হয়েছিল। একজন 'কাল্পনিক নারী'র নামে বিদ্যালয়ের নামকরণ হবে এটা অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। বনলতা নামকরণের প্রতিবাদ জানিয়ে কমিটির অন্যতম সদস্য সাহিত্যিক সাংবাদিক গজেন্দ্রনাথ কর্মকার ও কবি হাসান উদ্দিন সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। তবে এসব বিরোধিতা সত্ত্বেও তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক ইউনুস আলী বনলতা নামেই স্কুলটির নামকরণে অনড় থাকেন।[৫]

নাটোরের সাংবাদিক দেবাশীষ সরকার জানান, বনলতা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। প্রতিষ্ঠার সময় প্রধান ভূমিকা রাখেন পৌর চেয়ারম্যান ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী, স্থানীয় সাংবাদিক নূর হোসেন, গজেন্দ্রনাথ কর্মকার, হাসান উদ্দিন সরকার কবিরত্ন প্রমুখ। গজেন্দ্র কর্মকারের মেয়ে সাবেক পৌর কাউন্সিলর মঞ্জুরী লাহিড়ী হাসি জানান, তার বাবার প্রস্তাব ছিল স্কুলের নাম হবে 'বনলতা সেন বিদ্যানিকেতন'। পরে 'সেন' ও 'বিদ্যানিকেতন' কেটে দিয়ে শুধু বনলতা বালিকা বিদ্যালয় রাখা হয়।

বনলতা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিভাষ রঞ্জন দাস জানান, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে ২টি শাখা আছে। প্রভাতী শাখা তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি আর দিবা শাখা ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি। জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন কবিতার নামে এই বিদ্যালয়ের নামকরণের কারণে এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা গর্ববোধ করেন বলেও জানান তিনি। তবে স্কুলের পরিবেশ ও মান বাড়ানোর প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নাটোরের জেলা প্রশাসক ছিলেন শাহিনা খাতুন। এখান থেকে বিদায় নেয়ার সময় ২০১৮ সালের ৯ অক্টোবর তিনি 'গল্প নয় সত্যি : বিদায়বেলায় দুটি কথা' শিরোনামে একটি আবেগঘন মন্তব্য লেখেন, যা নাটোর জেলার তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তার কথায়ও বনলতা সেনের প্রতি গভীর মমতার প্রকাশ রয়েছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি অফিসের গেটের পাশে বনলতা সেন ভাস্কর্য নির্মাণ এবং বনলতা সেন চত্বর বানাতে না পারার আক্ষেপ করেছেন। সেই সাথে বনলতা বালিকা বিদ্যালয়কে আরও আধুনিক করতে চেয়েছিলেন বলেও উল্লেখ করেন।[৬]

বস্তুত নাটোরের সঙ্গে বনলতা সেনের সম্পর্ক নিয়ে যতটুকু জানা যায় তার সবই মিথ। শহরের বাসিন্দা শফীউদ্দিন সরদারের বরাতে অনীক মাহমুদ লিখেছেন : জীবনানন্দ দাশ দার্জিলিং যাচ্ছিলেন। দার্জিলিং মেল নাটোর হয়ে যেতো। নাটোর স্টেশনে এক ভদ্রলোক (নাম ভুবন সেন) এক মেয়েকে নিয়ে উঠলেন। মেয়েটির সাথে ট্রেনেই জীবনানন্দের আলাপ হয়। মেয়েটির নাম ছিল বনলতা সেন।[৭]

আরেকটি বর্ণনা এরকম : 'নাটোরের রাজার আমন্ত্রণে জীবনানন্দ দুদিনের জন্য নাটোরে গিয়েছিলেন। এ সময় কবির সেবায় যে কজন সুন্দরী ছিলেন তাদের একজনকে কবির ভালো লাগে। তিনি তাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখতে চাইলে সেই সুন্দরী রমণীর অনুরোধে কবি তারই নাম পাল্টে বনলতা সেন (ছদ্মনাম) দিয়ে কবিতাটি লেখেন। তবে জীবনানন্দের জীবনীগ্রন্থ, এ যাবৎ উদ্ধারকৃত তার ডায়েরি ও চিঠি কিংবা তার সুহৃদদের কারো স্মৃতিচারণায় জীবনানন্দের নাটোরে যাওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

নাটোরের অধিবাসী গুরুদাস সরকারে বরাতে অনীক মাহমুদ লিখেছেন, জীবনানন্দ দাশ একবার নাটোরে এসেছিলেন। নাটোরের সুকুল পরিবারের তারা প্রসাদ সুকুল সাহিত্যমোদী ছিলেন। তার ম্যানেজার ছিলেন ভুবন

সেন। ভুবনের বিধবা বোন বনলতা সেন। কবি দুপুরের খাবারের জন্য নিমন্ত্রিত হন তারা প্রসাদ সুকুল অথবা ভুবন সেনের বাড়িতে। খাবার পরিবেশ করেছিলেন বনলতা সেন। সেখানেই তার সাথে কবির দুদণ্ডের পরিচয়।' বাস্তবতা হলো যদি ভুবন সেন এবং বনলতা সেন নামে তার একজন বিধবা বোন থেকেও থাকেন, তারপরও কবির নাটোরে যাওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবার কারো বর্ণনায় বনলতা সেনকে বলা হচ্ছে ভুবন সেনের মেয়ে, কারো বর্ণনায় বিধবা বোন। অর্থাৎ এখানেও অস্পষ্টতা। বনলতা সেন চিরকালই এরকম অস্পষ্ট, রহস্যময়। আমরা সুরঞ্জনা, সুচেতনা, সুদর্শনা, শ্যামলি, শঙ্খমালা, সবিতা কিংবা অরুনিমা স্যানালের নাম জানলেও জীবনানন্দের এই নারীদের বিষয়ে আমাদের বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই। তাঁদের ঠিকুজি অন্বেষণে ব্যস্ত নই। কিন্তু বনলতা সেনের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহের মূল কারণ তাঁর বাড়ির ঠিকানা এবং সেন পদবি যুক্ত করে জীবনদাশ তাঁকে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন।

আবার বনলতা সেন নামে রক্তমাংসের কোনো মানবীর অস্তিত্ব থাকতেই হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তাঁর বাড়ি নাটোরেই হতে হবে, এমনও নয়। বরং তাঁর বাড়ি বরিশাল কিংবা খুলনায়ও হতে পারতো। হতে পারতো কলকাতার হ্যারিসন রোডে। তখন আমরাও তাঁকে খুঁজতাম খুলনায়, বরিশালে কিংবা হ্যারিসন রোডে। অথচ তিনি হয়তো কোনোদিন জন্মগ্রহণই করেননি। অথবা হয়তো জন্ম নেবেন কোনো একদিন।

কখনো ছিলেন তিনি?

বনলতা সেন কবিতাটি একবারে লেখা হয়নি। এর যে খসড়াটি পাওয়া যায় তার শুরুটা এরকম :

'শেষ হলো জীবনের সব লেনদেন
বনলতা সেন।
কোথায় গিয়েছ তুমি আজ এই বেলা
মাছরাঙা ভোলেনি তো দুপুরের খেলা।'

পরের পঙ্‌ক্তিকে কবির প্রশ্ন :

'তোমার মতন কেউ ছিল কি কোথাও?
কেন যে সবের আগে তুমি চলে যাও
কেন যে সবের আগে তুমি
পৃথিবীকে করে গেলে শূন্য মরুভূমি।'

অর্থাৎ বনলতা সেন বা তার মতো কেউ কোনোদিন কোথাও ছিল কি না, সেই প্রশ্ন জীবনানন্দ নিজেই করেছেন। অতএব বনলতা সেনের পরিচয় রহস্যের কুলকিনারা করা কঠিন। ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই শ্রেয় যে, বনলতা সেন কোনো একজন নির্দিষ্ট পরিচয়ের, নির্দিষ্ট পদবির এবং নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার কোনো নারী নন; তিনি সর্বজনীন, ইউনিভার্সাল চরিত্র।

অশোক মিত্র লিখেছেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৩৩ অথবা ১৯৩৪, রাজবন্দিদের কারাগার-যাপনের খবর থাকত মাঝে মাঝে। জীবনানন্দ সেরকম একটি তালিকায় দেখেছিলেন বনলতা সেন নাম্নি এক রাজবন্দিনীকে কোনো এক জেল থেকে রাজশাহী জেলে পাঠানো হয়েছে। সেই পছন্দের নামটা ঘিরেই 'বনলতা সেন'র জন্ম।' অশোক জানতে চেয়েছিলেন, নামটি তাকে আকর্ষণ করার সূত্রেই কি কবিতাটির উন্মেষ নাকি কবিতাটির কাঠামো ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছিল? নিরুত্তর জীবনানন্দ শুধু চুপ করে বসেছিলেন।[৮]

দিল্লির পতিতালয় ও সুধীর কুমার

আকবর আলি খান অন্ধকারে মুখোমুখি বসে থাকার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বনলতাকে নাটোরে গিয়েই আবিষ্কার করেছেন, সেদিকে নিশ্চয়ই আমাদের আলোকপাত করতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাদের সুধীরকুমারকে নিয়ে একটা মীমাংসায় পৌঁছানো জরুরি। কেননা আমাদের মনে হবে যে, এই সুধীরকুমারই বনলতা সেন।

একটা বিশুদ্ধ চাকরির জন্য জীবনানন্দকে সারা জীবন কী ভীষণ কাঠখড় পোহাতে হয়েছে, তা সবার জানা। আজ এ কলেজ তো কাল ও কলেজ এমনকি বিমা কোম্পানির দালালি। এতকিছুর মধ্যেও ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে দিল্লির রামযশ কলেজে যোগ দেন। কিন্তু পুরাতন দিল্লি থেকে দূরে এক শুষ্ক অনুর্বর 'কালোপাহাড়' এলাকায় অবস্থিত, প্রচণ্ড শীতের সময় যোগদানের পর অনেক কষ্ট সহ্য করেই মাস চারেক ছিলেন। পরিত্যক্ত সেই পাহাড়ি এলাকায় বন্ধু হিসেবে দুজন সহকর্মীকে পেয়েছিলেন যাদের একজন বরিশালের সুধীর কুমার দত্ত। নিঃসঙ্গ একাকী জীবনানন্দ প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সুধীরের সাথে মিলিত হতেন। মাঝে মধ্যে ডেকে নিয়ে যেতেন কলেজের ক্লাবে। এই সুধীরকুমারের সাথেই জীবনে প্রথম এবং সম্ভবত শেষবারের মতো তিনি দিল্লির পতিতালয়ে গিয়েছিলেন।

ড. আকবর আলি খানের মতে, 'বনলতা বাংলাদেশে ব্যবহৃত কোনো সাধারণ নাম নয়। তার স্খলনের পরে নিজের পরিচয় লুকানোর জন্য সে হয়তো ছদ্মনাম নিয়েছে।' মি. খান এও যুক্তি দেন যে, বনলতার সেন পদবি প্রমাণ করে তিনি ভদ্রবংশ উদ্ভূত। অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে, ভদ্র ঘরের এই নারী পতিতাবৃত্তি শুরু করার পরে তিনি তার আসল নাম বদলে ফেলেছিলেন। যেমন এই সময়েও যেসব নারী নানা কারণে এই পথে আসেন তারা ক্লায়েন্ট বা খদ্দেরের কাছে নিজের আসল নাম বলেন না। তারা নিজেদের নাম বলেন নদী, পাখি, লতা, আশা ইত্যাদি। ফলে জীবনানন্দের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনকারী ওই নারীর নাম হয়তো অন্য কিছু। কিন্তু সেই নারী হয়তো নিজের নাম বলেছেন বনলতা অথবা জীবনানন্দই তার নামটি গোপন রাখার জন্য এই নামটি দিয়েছেন।[৯]

আকবর আলি খান আমলা ছিলেন। দেশের নানা প্রান্তে ঘুরেছেন। নাটোরেও ছিলেন অনেকটা সময়। তাঁর ভাষায়, 'বিংশ শতকের অনেক প্রশাসকই এ কথা লিখতে ভুলেননি যে নাটোর উত্তরবঙ্গের 'রূপজীবীদের' (বেশ্যা বা পতিতা কিংবা গণিকার মার্জিত প্রতিশব্দ) একটি বড় কেন্দ্র ছিল। মি. খান জীবনানন্দের জীবনী বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, ১৯২৯ এর ডিসেম্বর ও ১৯৩০ এর জানুয়ারির মধ্যবর্তী কোনো সময়ে দিল্লিতে পতিতালয়ে যান এবং হয়তো বন্ধু সুধীরকুমারের সাথেই। তাহলে তিনি নাটোরের কথা কেন লিখলেন? নারীর নামের মতো স্থানের নাম গোপনের জন্য? নাকি দিল্লির ওই অভিজ্ঞতার আগে-পরে তিনি নাটোরে গিয়েছিলেন অথবা দিল্লিতে যে নারীর সংস্পর্শে এসে 'দুদণ্ড' শান্তি পেয়েছিলেন, সেই নারীর সাকিন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের নাটোরে?

আকবর আলি খান এই 'দুদণ্ড' শব্দটির উপর জোর দিয়ে এটি প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, পতিতালয়ে একজন পুরুষ আসলে দুদণ্ড শান্তি পাওয়ার জন্যই যায়। এটি দীর্ঘস্থায়ী বসবাস কিংবা দীর্ঘস্থায়ী শান্তির ঠিকানা নয়। দুদণ্ড শান্তির আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, বনলতা নামে ওই নারীর সঙ্গে জীবনানন্দের একবারই দেখা হয়েছিল এবং দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের কোনো ইঙ্গিত এই কবিতায় নেই।

বনলতার সাথে জীবনানন্দের সম্পর্কটা যে 'অবৈধ' ছিল, সেটি প্রমাণে মি. খান চার ধরনের যুক্তি দিয়েছেন।

১. বনলতা সেন কবিতার নায়িকা অন্ধকারের প্রাণি (দেখেছি তারে অন্ধকারে); ১৮ লাইনের কবিতায় পাঁচবার 'অন্ধকার' শব্দটি এসেছে।

২. বনলতার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বারবার বিনোদবালাদের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। আর বিশেষ করে নাটোরের কথা বলেছেন কারণ বারবণিতার জন্য এই শহরের প্রসিদ্ধি ছিল।

৩. কবি বলেছেন, বনলতা সেন তাকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল। দুদণ্ডের শান্তি কারা দেয় তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন আকবর আলি খান।

৪. বনলতার সাথে কবির পূর্ব পরিচয় ছিল না। যে কারণে তার সাথে যখন প্রথম দেখা হয়, বনলতা বিস্ময়ে আনন্দে শিহরণে জিজ্ঞেস করেছেন, 'এতদিন কোথায় ছিলেন!' এটি সৌজন্যমূলক প্রশ্ন নয়। অর্থাৎ জীবনানন্দ যখন তাকে প্রেম নিবেদন করলেন, তখন বনলতা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এখন আর এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়। কারণ বড্ড দেরি হয়ে গেছে। পতিতালয়ে গিয়ে পতিতার প্রেমে পড়া এবং তাকে নিয়ে ঘরসংসার করার অনেক দৃশ্য সিনেমায় দেখা যায়। জীবনানন্দ হয়তো সেরকম নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বনলতা তাতে সায় না দিয়ে বলেছেন, এতদিন কোথায় ছিলেন। অর্থাৎ আরও আগে আসেননি কেন?

আকবর আলি খানের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে বলা যায়, প্রথমবার দেখা হয়েছিল বলেই যে বনলতা সেন তার কাছে জানতে চেয়েছেন 'এতদিন কোথায় ছিলেন'— এমনটি নাও হতে পারে। কারণ ব্যাখ্যাটা উল্টোও হতে পারে। ধরা যাক, বনলতার সঙ্গে তার আগেও দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তারপর থেকেই বনলতা সেন তার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। দীর্ঘকাল পরে যখন দেখা, তখন হৃদয় নিংড়ানো সেই প্রশ্নটি তিনি ছুড়ে দিয়েছেন,

'এতদিন কোথায় ছিলেন'! অর্থাৎ আমি আপনার জন্য এতদিন অপেক্ষায় ছিলাম।

বনলতা সেন নিয়ে জীবনানন্দের জীবদ্দশাতেই নানা প্রশ্ন ও বিতর্ক ওঠে। কিন্তু তিনি নিজে এর কোনো ব্যাখ্যা দেননি। অনেকে বিরূপ মন্তব্য করলেও তিনি তা অপনোদনের চেষ্টা করেননি। তিনি এই কবিতার যে ইংরেজি অনুবাদ করেন, সেখানে যেন সচেতনভাবেই দুদণ্ড শান্তির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। সেখানে তিনি বরং বনলতার প্রজ্ঞা বা Wisdom এর কথা লিখেছেন,'I had Banalata Sen of Natore and her wisdom'. তিনি কি বনলতা নিয়ে বিতর্ক এড়াতেই এর ইংরেজি অনুবাদ করে এটিকে নৈতিক দিক দিয়ে ধোপ-দুরস্ত করেছেন? প্রশ্ন আকবর আলি খানের।

প্রশান্তির অন্য নাম

সহকর্মী শাহরিয়ার শিশির অফিসের সামনের ফুটপাতে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বনলতা সেন আসলে কে?' তাকে বললাম, আপনিই বনলতা সেন। অথবা আমি। কিংবা আমরা। শিশির বিস্মিত হন। তাকে খেয়াল করতে বলি এই লাইনটির দিকে: 'আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন'। এখানে 'দুদণ্ড শান্তি' শব্দযুগল খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানে হলো, আমরা যার কাছ থেকে দুদণ্ড শান্তি পাই, তিনিই বনলতা সেন। এই যে আপনি আমার সাথে এক কাপ চা খেতে খেতে বনলতা সেন নিয়ে আলোচনা করছেন এবং আমি খেয়াল করছি যে, আপনার ভেতরে একটা প্রশান্তির ছায়া— তার মানে হলো এখানে আমিই বনলতা সেন। আপনি যদি আপনার প্রিয়তমার কাছে গিয়ে দুদণ্ড শান্তি পান, তাহলে তিনিই বনলতা সেন। আপনি যদি আপনার মায়ের সাথে গল্প করে দুদণ্ড শান্তি পান, তাহলে আপনার মা-ই বনলতা সেন।

একটি 'বিশুদ্ধ চাকরি'র পেছনে ছুটে হয়রান জীবনানন্দ বস্তুত সারা জীবনই দুদণ্ড শান্তির কাঙাল ছিলেন। জীবনের শেষবেলায় এসে সেই শান্তি ধরা দিয়েছিল কলকাতা শহরের কাছেই হাওড়া গার্লস কলেজে। জীবনের শেষ দেড় বছর এখানে অধ্যাপনা করেন। এই কলেজের পরিবেশ, শিক্ষক, সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের যে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর অন্তরঙ্গতা তিনি পেয়েছেন, সে কথা তাঁর মৃত্যুর পরে ওই কলেজ থেকে প্রকাশিত হাওড়া গার্লস কলেজ পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এই কলেজে তাঁর সহকর্মী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন, শেষ জীবনের বেশ কিছুদিন তার হাওড়া গার্লস কলেজে কেটেছে এবং তিনি খুশি হয়েছিলেন।১০ জীবনানন্দের জীবনের শেষ দেড় বছর যে সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা তাঁকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিলেন, তারাও বনলতা সেন। অর্থাৎ বনলতা সেন এখানে ইউনিভার্সাল বা সর্বজনীন; একটা প্রতীক। নারী-পুরুষের জেন্ডার বা সেক্সের বহু ঊর্ধ্বে। এখানে বনলতা সেন প্রশান্তির অন্য নাম।

জীবনানন্দের জীবনে আরও একাধিক বনলতা সেন এসেছেন। যেমন ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পরে ডাক্তার যখন বললেন নিয়মিত হাঁটতে, তখন সুবোধ রায় নামে একজন বনলতা সেনের সন্ধান তিনি পান যাকে নিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হাঁটতে বের হতেন। জীবনানন্দের জীবনে সবশেষ বনলতা সেনের নাম শান্তি মুখার্জি—যিনি তাকে সবশেষ দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিলেন হাসপাতালের বিছানায়।

১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর ট্রাম দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নেয়া হয় জীবনানন্দকে। রোগী একজন কবি জানতে পেরে নার্স শান্তি মুখার্জির মনে যেন দয়ার উদ্রেক হয়। তার উদ্বেগ বেড়ে যায়। যেন একটু বাড়তি সচেতন। যত্ন-আত্তিতে কমতি না হয়। শাহাদুজ্জামান লিখছেন, 'একটা ভেজা তোয়ালে দিয়ে তিনি জীবনানন্দের গা, মুখ মুছিয়ে দিলেন, চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দিলেন চুল। তাঁর মাথার কাছের টেবিলে একটা ফুলদানিতে রেখে দিলেন ফুল। অপরিচ্ছন্ন ইমার্জেন্সির একটা কোণকে শান্তি করে তুললেন মরুদ্যান।' ২২ অক্টোবর মৃত্যুবধি শান্তি মুখার্জি নামের এই নার্স, এই বনলতা সেন জীবনানন্দকে দুদণ্ড শান্তি দিয়ে যান। জীবন সায়াহ্নে কবিকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টায় কোনো খাদ রাখেননি এই নারী।[১১] রাতে হাসপাতালে জীবনানন্দকে পালাক্রমে পাহারা দিতেন ওই সময়ে মেডিকেলের ছাত্র ভূমেন্দ্র গুহ, স্নেহাকর ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, জগদিন্দ্র মণ্ডলসহ তাদের বন্ধুরা। ভূমেন্দ্র লিখছেন, 'রাতের বেলার নার্সটির (শান্তি ব্যানার্জি) ছোট ছোট হাত দুটি

অসীম সেবাপরায়ণতা, বৃথা বাক্যব্যয় করা তাঁর ধাত নয়। ডিউটিতে এসেই জীবনানন্দকে নিয়ে নিদারুণ ব্যস্ত তহয়ে পড়লেন, কীভাবে যে এতটা হাড়গোড় ভাঙাচোরারর কষ্ট থেকে দুর্দৈব থেকে তাঁকে স্বস্তি জোগানো যায় সেই ম্যাজিক তিনি রপ্ত করে ফেলতে পারছেন না বলে মনে হল যেন তিনি নিজেকেই দুষছেন।'[১২]

শান্তি ব্যানার্জি যখন জানলেন যে তিনি যার সেবা করছেন তিনি মস্তবড় কবি—তখন হাসপাতালে ডিউটির আগে একদিন সকালে শাড়ি পরে সেজেগুজে জীবনানন্দের অনুজ ভূমেন্দ্রদের 'ময়ূখ' পত্রিকার আড্ডাখানায় এসে হাজির। ব্যাগের ভেতরে বনলতা সেন। একজন নার্সের এমন কবি ও কাব্যপ্রীতি দেখে ভূমেনরা বিস্মিত। তখন যুবকরা পরস্পর বলাবলি করেন, 'বনলতা সেন মহিলাটি যে তরুণ বয়সীদের কী বিধ্বংসীভাবে করাপ্ট করতে পারেন, তা আমি-আপনি অনেক দিন ধরে পুরোপুরি করাপ্টেড হয়ে আছি বলে আর তেমনভাবে মনে করতে পারি না। কিন্তু বনলতা সেন ওঁকেও (শান্তি ব্যানার্জি) করাপ্ট করবেন। ওঁর ভেতরের বনলতা সেনকে ঘুম থেকে টেনে তুলবেন এবং তারপর তিনি দুদণ্ড শান্তি দেবেন।' ভূমেন, দিলীপ, সমররা তখন এই নার্সকে 'লক্ষ্মী পয়মন্ত মেয়ে' উপাধি দিয়েছিলেন। শান্তি ব্যানার্জি পরে বলেছেন, 'এত বড় একজন লোকের জীবন-মরণ সংকটে আমি নার্সিং করার সুযোগ পেয়ে গেছি, একজন নার্স এর চেয়ে বেশি সৌভাগ্য আর কী কামনা করতে পারে।' জানা যায়, শান্তি ব্যানার্জি বলেছিলেন, 'ওঁরা (জীবনানন্দের পরিবার) আমাকে টাকাকড়ি দিন বা না দিন, আমি তো প্রতি রাত্রেই ওঁর (জীবনানন্দ) নার্সিং করতে চলে আসব।' এবং শান্তি ব্যানার্জি এসেছিলেনও। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জীবনানন্দের পাশে ছিলেন। ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর রাত ১১.৩৫ মিনিটে মৃত্যুর মুহূর্তটির বর্ণনায় ভূমেন্দ্র লিখছেন, 'শুধু দেখলাম শুধু শুনলাম সিস্টার শান্তি দেবীর চোখে অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি পবিত্র ঘণ্টার মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে। এগারোটা পঁয়ত্রিশ। সবাই স্তব্ধ, কান্না চাপবার একটি ব্যর্থ প্রয়াস। তিনি কাঁদছেন। চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেল আকাশের দিকে চেয়ে কবিতা বলার সাধ। পাণ্ডুলিপির রঙ মুছে গেল জীবনানন্দের চোখ থেকে।'

কিন্তু শান্তি ব্যানার্জি কি জীবনানন্দের কবিতা বুঝতেন? বললেন, 'ভলো

নাটোরে বনলতা সেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

করে তো সব বুঝতে পারি না, তবু টানে তো, এত টানে যে'—বলতেই হাতব্যাগের চেইনটা খুলে বনলতা সেনের একটি কপি বের করে দেখালেন। ভূমেন্দ্র গুহরা তখন বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন হাসপাতালের একজন নার্সের দিকে—একজন বনলতা সেনের দিকে।

জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দাশও স্বীকার করছেন, 'সিস্টার শান্তিদেবীর কথা আমার আজও মনে আছে—এবং চিরদিনই থাকবে। জীবিকার্জনের জন্য তাকে টাকা নিতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার সেবার মধ্যে যে দরদ, যে আন্তরিকতা আমি দেখেছি, তা শুধু টাকার বিনিময়ে কোনোদিনই পাওয়া যায় না। কবির মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার পরে শান্তিদেবীও চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন।'[১৩]

যদিও নির্মম ইতিহাস বলছে, হাসপাতালে জীবনের শেষ কয়েক দিন জীবনানন্দকে দেখতে আসেননি তাঁর স্ত্রী লাবণ্য দাশ; যিনি হতে পারতেন জীবনানন্দের জীবনের প্রধানতম বনলতা সেন। দুদণ্ড শান্তি দূরে থাক, সারা জীবনই একরকম টানাপড়েনের সম্পর্ক বুনে গেছেন তারা। শোনা যায়, লাবণ্য তখন ব্যস্ত ছিলেন টালিগঞ্জে সিনেমার কাজে। মৃত্যুর পর রাতেই হাসপাতাল থেকে জীবনানন্দের মরদেহ নিয়ে আসা হয় ১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউয়ে ছোট ভাই অশোকানন্দের বাসায়। এখান থেকে জীবনানন্দের বাসা ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড হাঁটাপথ। লাবণ্য দাশ নিশ্চয়ই রাতেই স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনেছেন। কিন্তু ভাইয়ের বাসায় স্বামীর মরদেহ দেখতে এসেছেন পরদিন সকাল নয়টায়। ভূমেন্দ্র গুহ বলছেন, 'এখনও ছবিটা আমার মনে আছে। সাদা শাড়ি, হলুদ পাড়, ম্লান করে চুলটুল আঁচড়ে এসেছেন। তখনো গায়ে সুগন্ধ রয়েছে। এসে সরাসরি উপরে উঠে গেলেন।'[১৪]

ডালপুরির ঠোঙা

২০১৭ সালের ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের দোতলায় ২৩০ নম্বর রুমে ঘণ্টা দুয়েক আড্ডা দেয়ার পর আমাদের চায়ের তৃষ্ণা পায়। সিঁড়ি বেয়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে অদূরে ফুটপাতে কুপি জ্বালানো একটি ডালায় হলুদ ডালপুরি আমাদের নজরে আসে। বৃদ্ধ দোকানি ডালপুরি চার টুকরো করে তাতে শশাকাটা, কাঁচামরিচ আর বিট লবণ দিয়ে মুদ্রিত বইয়ের ছেঁড়া পৃষ্ঠায় পেঁচিয়ে দিচ্ছেন। ভাঁজ করে রাখা শখানেক কাগজের মধ্যে জীবনানন্দের ছবিসম্বলিত একটি কাগজ জ্বলজ্বল করছিল কুপির আলোয়। তাঁর 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার পৃষ্ঠা। কোন ক্লাসের বইয়ের পৃষ্ঠা তা অবশ্য উদ্ধার করা যায়নি। তবে তিনি যে ফিরে আসবেন বলেছিলেন, সেটির একটি অদ্ভুত দৃশ্যায়ন আমরা দেখলাম এই সন্ধ্যায়।

এই দৃশ্য দেখে আমার বনলতাকেই মনে পড়ে। থাকে শুধু অন্ধকার। এখানে কিছুটা আলো আছে। মুখোমুখি বসিবার যে মানুষ, যে দুদণ্ড শান্তি দেয়—তখন মনে হয় এই পুরিওয়ালাই বনলতা সেন— যে কি না মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনের এই ফুটপাতে আমাদের দুদণ্ড শান্তি দিয়ে গেলেন, জীবনানন্দের মৃত্যুর ছয় দশক পরে। জীবনানন্দ মৃত্যুর পরে কমলালেবু হয়ে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন কোনো এক মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে। কিন্তু তিনি যে এভাবে ডালপুরি পেঁচানোর ঠোঙা হয়ে ফিরে আসবেন, তা হয়তো ভাবেননি।

বনলতা সেন 'কৈকেয়ী বুড়ি' নন

জীবদ্দশায় জীবনানন্দের সবচেয়ে খ্যাততম কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন' (যেটির জন্য জীবিত অবস্থায় একমাত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন, নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কার) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে বুদ্ধদেব বসুর তত্ত্বাবধানে তার কবিতা ভবনের ঠিকানায়, যেটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শম্ভু সাহা। জীবনানন্দ তখন বরিশালে থাকেন, ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক। ফলে বইয়ের ঠিকানায়ও সর্বানন্দ ভবন। এর ১০ বছর পরে ১৯৫২ সালে বর্ধিত কলেবরে 'বনলতা সেন' প্রকাশ করে সিগনেট প্রেস; যেটি সিগনেট সংস্করণ নামে পরিচিত। সিগনেটের স্বত্বাধিকারী দিলীপ গুপ্ত ওই সময়ের তরুণশিল্পী সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে বনলতা সেনের প্রচ্ছদ আঁকান। কিন্তু প্রচ্ছদটি জীবনানন্দের পছন্দ হয়নি। কিন্তু নিজের এই অসন্তুষ্টি তিনি দিলীপ গুপ্তকে বলেননি। তার কয়েকজন সুহৃদকে সন্তর্পণে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, 'এ কোন বনলতা সেন, এটা তো কৈকেয়ী বুড়ি।' অশোক মিত্র মনে করেন, মূলত বনলতা সেনের প্রথম প্রচ্ছদটি ছিল ভারী মায়ালু, যা জীবনানন্দ ভুলতে পারেননি।[১৫]

বনলতা সেনের প্রচ্ছদ নিয়ে আরেকটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন প্রভাতকুমার দাস। তাঁর সুহৃদ 'জলার্ক' পত্রিকার সম্পাদক সুরজিৎ দাশগুপ্ত একদিন বনলতা সেন-এর সিগনেট প্রেস সংস্করণের একটি বই কিনে সোজা জীবনানন্দের বাসায় হাজির। বললেন, অটোগ্রাফ চাই। জীবনানন্দ রাজি হলেন না। বললেন, 'নাম সই করে তোমাকে কত চিঠিই তো লিখেছি। আবার এ বইয়ে কেন?' সুরজিৎ জেদ ধরলেন। বললেন, 'আপনার বইয়ে আপনার সই থাকবে।' সুরজিতের হাত থেকে বইটা নিয়ে নেড়েচেড়ে বললেন, এতদিন ধরে শেষে এই প্রডাকশন? মলাটটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কি বনলতা সেন নাকি কোনো শেওড়াবনের সুন্দরী? অত বড় প্রকাশক, এত বড় শিল্পী!' বইটা সুরজিতকে ফেরত দিয়ে গুম হয়ে বসে রইলেন। তবে সুরজিৎ প্রচ্ছদের মাহাত্ম্য বোঝানোর চেষ্টা করলেন : শিল্পী বোধহয় শ্রাবস্তীর কারুকার্য ফোটাতে চেয়েছেন। এ কথা শুনে বিষণ্ন গলায় জীবনানন্দ বললেন, 'আর বিদিশার নিশাটা দেখতে পেলেন না, বনলতা সেন নামটাও শুনতে পেলেন না।' জানালেন, সাহিত্যে কোনো চরিত্রের যখন নাম দেয়া হয় তখন সেই নামের সঙ্গেও রূপের একটা ভাবনা থাকে। রবীন্দ্রনাথ কি গোরার বদলে নিমাই নামটা রাখতে পারতেন?[১৬]

বনলতা সেনের সিগনেট প্রেস সংস্করণ যে জীবনানন্দকে খুশি করতে পারেনি সে কথা স্পষ্টত সুরজিৎকে লেখা একটি চিঠিতেও স্পষ্ট। ১৯৫২ সালের ৬ অক্টোবর ওই চিঠিতে তিনি লিখেছেন : 'আমার বনলতা সেন দেখে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি। এমন খারাপ প্রচ্ছদপট আমি আমার জীবনে দেখিনি। সিগনেট প্রেসের হাতেও বইয়ের এই দশা। এরপরে কবিতার বই বার করলে আমি নিজে আগাগোড়া সব দেখেশুনে ঠিক করব।'[১৭]

এই কথা তিনি আরও অনেককে বলেছেন। বড়িশা কলেজে তার সহকর্মী অধ্যাপক নিরঞ্জন চৌধুরীকে বলেছিলেন। বোন সুচরিতা দাশকেও বলেছিলেন, 'এই প্রচ্ছদটা কেমন হয়েছে বল তো? আমার কিন্তু একেবারেই ভালো লাগেনি। আমি কি রাজকুমারী অমৃতকুমারীকে ভেবে

এইসব কবিতা লিখেছিলাম?'[১৮]

প্রসঙ্গত, সত্যজিৎ রায় যখন বনলতা সেনের প্রচ্ছদ আঁকেন, তখন তিনি সিগনেট প্রেসের শিল্পী হিসেবে কর্মরত। পরবর্তীকালে তিনি প্রখ্যাত লেখক ও চলচ্চিত্রনির্মাতা। অথচ এমন একজন মানুষের আঁকা প্রচ্ছদ নিয়ে জীবনানন্দ যারপরনাই ক্ষুব্ধ ছিলেন। এরপর অবশ্য জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সিগনেট প্রেস সংস্করণ এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'রুপসী বাংলা', জীবনানন্দের ছোট ভাই অশোকানন্দ দাশের মালিকানাধীন নিউস্ক্রিপ্ট প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'বেলা অবেলা কালবেলা', প্রবন্ধের বই 'কবিতার কথা', উপন্যাস 'মাল্যবান' ও 'সুতীর্থ'র প্রচ্ছদও এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়।

বনলতা ট্রাম ও ট্রেন

জীবনানন্দের মৃত্যুর কয়েক দশক পরে কলকাতার রাস্তায় নেমেছিলেন বনলতা সেন; মানুষ নয়, ট্রাম হয়ে। ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর কলকাতার রাসবিহারী এভিনিউয়ে যে ট্রামের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ, পরবর্তীকালে এক অগ্নিকাণ্ডে সেই ট্রামটি পুড়ে যায়।[১৯] এও এক রহস্য, বিপন্ন বিস্ময়! এর বহু বছর পরে জীবনানন্দের প্রতি সম্মান জানিয়ে 'বনলতা' নামে একটি হেরিটেজ ট্রাম চালু করেছিল কলকাতা ট্রাম কর্তৃপক্ষ সিটিসি। তারা মাঝে মধ্যেই বিশেষ কারো প্রতি সম্মান রেখে বা বিশেষ দিবস উপলক্ষে এরকম হেরিটেজ ট্রাম চালু করে। কিন্তু সেগুলো বেশিদিন চলে না। এটা অনেকটা বিশেষ দিবসে স্মারক ডাকটিকিটের মতো। যতটুকু জানা যায়, বনলতা হেরিটেজ ট্রামও মাসখানেক চলার পরে বসিয়ে দেয়া হয়। ওই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' নামেও একটি হেরিটেজ ট্রাম চালু করা হয়। এর একটি পরবর্তীকালে ধর্মতলা সিটিসি ট্রাম ডিপোর পাশেই কফিশপের মতো ব্যবহার করা হয়। যে কেউ সেখানে যেতে পারে। অন্যটি মোডিফাই করে এসি ট্রাম করা হয়েছে।[২০] সবশেষ ২০১৯ সালের ২৫ এপ্রিল ঢাকা-রাজশাহী রুটে 'বনলতা এক্সপ্রেস' নামে নতুন ট্রেন চালু করে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। আনুষ্ঠানিকভাবে এর যাত্রা শুরু হয় ২৭ এপ্রিল। এটি ঢাকা-রাজশাহী রুটে বিরতিহীন চলে। এই ট্রেনের নাম দিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি তার বক্তৃতায় মাঝে মধ্যেই জীবনানন্দ দাশের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।

ইউনিভার্সাল বনলতা সেন

আমরা ভিঞ্চির মোনালিসার পরিচয় জানতে পারি না। ভিঞ্চি নিজেও তার পরিচয় দেননি। যদিও এই ভূবনবিখ্যাত চিত্রকর্মটির প্রতি মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। তার হাসির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও অন্ত নেই। ফারুক ওয়াসিফ মনে করেন, জীবনানন্দ দাশের জীবনীতে কোনো বনলতা ছিল কি না কিংবা কোনো অসাধিত প্রণয় দুঃখের উদযাপন তিনি এই নামে করেন কি না, জীবনীকারের জন্য সেই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও কবিতার দার্শনিক সারসন্ধানে প্রশ্নটা অসার। দারোগার তদন্ত-তরিকা সাহিত্য বিচারে খাটে না। তাঁর কবিতার নারী নদী মানবীয় ও প্রাকৃতিক দশা থেকে উত্তরিত হয়ে আরও বড় অর্থের প্রতীক বা সিগনিফায়ার হয়ে ওঠে। বনলতা সেন শুধু ব্যক্তিমানবী নন, ধানসিঁড়ি কেবলই বাংলার এক সামান্য নয়; তা আরও বড় অর্থের দ্যোতক।'[২১]

আমরা জীবনানন্দের এই বনলতা সেনের পরিচয় জানতে যতটা উদগ্রীব, তাঁর কবিতার অন্য নারীগণ যেমন শঙ্খিনীমালা, সুরঞ্জনা কিংবা সুচেতনা পরিচয় জানতে অতটা নই। কেন? কারণ বনলতার সঙ্গে পদবি হিসেবে সেন এবং ঠিকানা হিসেবে নাটোর শব্দটি যুক্ত। সেই সাথে 'অন্ধকার' ও 'দুদণ্ড শান্তি' শব্দযুগলও এই আগ্রহের কারণ।

অর্থাৎ বনলতা সেন কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একজন নির্দিষ্ট নারী নন। বনলতা সেন ইউনিভার্সাল বা চিরন্তন ও শাশ্বত। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে যেকোনো সময়ে যে কেউ যে কারোর জন্য বনলতা সেনরূপে আবির্ভূত হতে পারেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই একজন বনলতা সেন বাস করেন এবং প্রত্যেকেই অন্যের ভেতরে বনলতা সেনকে পাওয়ার জন্য অধীর থাকেন। বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে বয়স্ক মুখাবয়ব দেখে জীবনানন্দ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ তিনি নিজেও মনে করতেন বনলতা চিরযৌবনা; তিনি কখনো বুড়ো হন না।

জীবনানন্দের বোন সুচরিতা দাশ এবং ছোট ভাই অশোকানন্দ দাশ সারা জীবন ভাইকে যেভাবে আগলে রেখেছেন, তাতে তারাও বনলতা সেন। কলকাতায় অনুজ বন্ধু ভূমেন্দ্র গুহসহ ওই সময়ে 'ময়ূখ' ও

> বনলতা সেন বা তার মতো কেউ কোনোদিন কোথাও ছিল কি না, সেই প্রশ্ন জীবনানন্দ নিজেই করেছেন। অতএব বনলতা সেনের পরিচয় রহস্যের কুলকিনারা করা কঠিন। ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই শ্রেয় যে, বনলতা সেন কোনো একজন নির্দিষ্ট পরিচয়ের, নির্দিষ্ট পদবির এবং নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার কোনো নারী নন; তিনি সর্বজনীন, ইউনিভার্সাল চরিত্র

'পূর্বাশা'পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত তরুণরাও বনলতা সেন। যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দের দুর্ঘটনার পর থেকে নিজের ঘরের মেঝেতে বসে কবির জন্য শুধু প্রার্থনাই করছিলেন এবং মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তটি কল্পনা করে লিখেছিলেন, 'একটি জাহাজ ছেড়ে গেলো'— সেই সঞ্জয়ও বনলতা সেন। অর্থাৎ বনলতা সেন মানুষের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হাসপাতালের বিছানার কাছে শান্তি ব্যানার্জির রূপে যেমন আবির্ভূত হন, তেমনি কাগজের ঠোঙায় সন্ধ্যার আলোতে সাদাকালো ছবি হয়েও আসতে পারেন। ফলে তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি : 'এতদিন কোথায় ছিলেন.।'

উৎস নির্দেশিকা

১. কবিতা, আশ্বিন ১৩৪২ সংখ্যা

২. কারুবাসনা, জীবনানন্দ রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ঐতিহ্য, পৃষ্ঠা ২৬৪

৩. ক্লিন্টন বি সিলি, অনন্য জীবনানন্দ (ফারুক মঈন উদ্দীন সম্পাদিত), পৃষ্ঠা ১৪২

৪. ক্লিন্টন বি সিলি, অনন্য জীবনানন্দ (ফারুক মঈন উদ্দীন সম্পাদিত), পৃষ্ঠা ১৪০

৫. অনিক মাহমুদ, আধুনিক সাহিত্য পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতি, পৃষ্ঠা ৬০

৬. তথ্য বাতায়ন, নাটোর: http://www.natore.gov.bd

৭. অনিক মাহমুদ, প্রাগুক্ত

৮. 'বনলতা সেন: কিছু এলোমেলো কথা', কবি সম্মেলন শারদীয় ১৪১৮, পৃষ্ঠা ১০৪-০৫

৯. আকবর আলি খান, অন্ধকারের উৎস হতে, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯

১০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁকে সহকর্মী হিসেবে দেখেছি, কোরক শারদ সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৩২

১১. একজন কমলালেবু, শাহাদুজ্জামান, পৃষ্ঠা ২৩৫

১২. ভূমেন্দ্র গুহ, আলেখ্য জীবনানন্দ, পৃষ্ঠা ৩১

১৩. লাবণ্য দাশ, মানুষ জীবনানন্দ, পৃষ্ঠা ৬৪

১৪. আনিসুল হক ও জাফর আহমদ রাশেদকে দেয়া ভূমেন্দ্র গুহর সাক্ষাৎকার, পুনর্মুদ্রণ জীবনানন্দ চর্চার পত্রিকা 'জীবনানন্দ', অক্টোবর ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৭

১৫. অশোক মিত্র, আপিল-চাপিলা, পৃষ্ঠা ১০৫

১৬. প্রভাতকুমার দাস, জীবনানন্দ দাশ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩৩

১৭. পত্রালাপ জীবনানন্দ দাশ, প্রভাতকুমার দাস সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ২১৫

১৮. গোপালচন্দ্র রায়, জীবনানন্দের সঙ্গে, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত জীবনানন্দ, পৃষ্ঠা ১৬৫

১৯. সেই রাতে রাসবিহারীর ট্রাম হয়ে উঠল ইতিহাসযান, এই সময়, ২২ অক্টোবর ২০১৩

২০. আমীন আল রশীদ, জীবনানন্দের খোঁজে: কলকাতার ট্রাম, সিল্করুট (বণিক বার্তা), ২৯ মার্চ ২০১৯

২১. ফারুক ওয়াসিফ, জীবনানন্দের মায়াবাস্তব, পৃষ্ঠা ২৬